আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণ বাংলাদেশ

IFI WATCH
BANGLADESH

বর্ষ ২, সংখ্যা ২
নভেম্বর ২০০৫

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যসংস্থা সংক্রান্ত কার্যদল, বাংলাদেশ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বাংলাদেশের কৃষি

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য মন্ত্রী পর্যায়ের ৬ষ্ঠ সম্মেলনে কৃষিখাতের বাণিজ্য আলোচনাই কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। ২০০৫ সালের ১৩-১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় এই সম্মেলনে কৃষির তিনটি প্রধান বিষয় – বাজারে প্রবেশাধিকার, অভ্যন্তরীণ সহায়তা এবং রপ্তানি ভর্তুকী – নিয়ে কোনো উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে কোনো রকম বোঝাপড়া না হলে অন্য আর কোনো বিষয়ে অগ্রগতি হবে না তা স্পষ্ট। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো এখনও কৃষি পণ্যের বাজার খুলে দেয়া, কৃষি উৎপাদনে সহায়তা হ্রাস এবং রপ্তানি সহায়তা কমানোর জন্য পরস্পর পরস্পরের ওপর চাপ তৈরি করছে। এই দরকষাকষিতে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কিছু পাওয়ার আছে কি না তা পর্যালোচনা প্রয়োজন। প্রধানত তিনটি কারণে, বাংলাদেশের জন্য কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনটি হলো: খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার নিরাপত্তা তথা কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ উন্নয়ন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কৃষির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ২২% আসে কৃষি থেকে। মোট কর্মসংস্থানের ৫১% যোগান দেয় কৃষি খাত। তবে বাংলাদেশের কৃষিখাতের ও কৃষকের আজকে যে দুরাবস্থা তাতে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় কৃষি ভর্তুকী প্রত্যাহার করা ও বাজার খুলে দেওয়া থেকে আমরা যে লাভবান হতে পারব না তা মোটাদাগে বলে দেয়া যায় অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে।

D`vixKi‡Yi wecÖZxc cÖfve

বাংলাদেশের কৃষিখাতের দুরবস্থার পেছনে একাধিক কারণ থাকলেও মূল সংকটটা শুরু হয়েছে সরকার কর্তৃক বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চাপে একতরফাভাবে বাজার উদারীকরণের নামে কৃষি উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ সহায়তা প্রত্যাহার করে নেয়া। এমনতিইে কৃষিখাতকে সহায়তা দেয়ার জন্য সম্পদ ঘাটতি চলছিল বহুদিন ধরে। সেই ঘাটতি পূরণের পথে না যেয়ে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ নির্দেশিত 'কাঠামোগত সমন্বয় নীতি'র (স্যাপ) আওতায় '৮০-র দশক থেকে কৃষিখাত বাজারমুখী করা আরম্ভ হয়। বীজ ও সেঁচযন্ত্রসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণের বাজার খুলে দেয়ার মাধ্যমে এই যাত্রার সূচনা। একই সাথে সরকার ক্রমান্বয়ে কৃষিকাজে অভ্যন্তরীণ সহায়তা দ্রুত প্রায় শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনে। এভাবে প্রায় দুই দশক ধরে কৃষিখাত উদারীকরণ ও সংস্কারের নামে সার বিপণন ও বন্টন, বীজ সরবরাহ এবং ক্ষুদ্র সেঁচ পর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হলো বাজারের হাতে। তার মানে, গরীব কৃষকের পক্ষে চাষবাসের জন্য উপকরণগুলির প্রাপ্তি হয়ে পড়ল কঠিন। অর্থের অভাবেতো বটেই, ধার-কর্জ করে অর্থ যোগাড় করা গেলেও উপকরণ পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা রইল না।

অন্যদিকে ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করার পর কৃষিচুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খুলে দেয়া হতে থাকে চালসহ কৃষিপণ্যের বাজার। এই সময়কালে সামগ্রিক আমদানি শুল্কহার ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়। অবশ্য শুল্কহার হ্রাসের এই প্রবণতা আরম্ভ হয়েছিল ঐ বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-য়ের পরামর্শে আরো আগে। ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের বাংলাদেশে আমদানি শুল্কের মোট ১৫টি ধাপ ছিল যেখানে সর্বোচ্চ শুল্ক ছিল ৩০০%। ১৩ বছর পর ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে এসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শুল্কহার ২৫% আর শুল্কধাপ চারটি (০%, ৭.৫%, ১৫% ও ২৫%)। শুল্কহার হ্রাসের ফলে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে কৃষিজাত পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য আমদানিও বাড়তে আরম্ভ করল। এতে দেশীয় কৃষিপণ্য নিজের দেশের বাজারেই হুমকির মুখে পড়ল। এই উদারীকরণ বাংলাদেশের কৃষির বাজারকে একটি বৈষম্যমূলক ও অপ্রতিযোগিতাশীল বাজারে পরিণত করেছে যেখানে মধ্যস্বত্বভোগী এক ধনিক শ্রেণী সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে যাদের সঙ্গে সরাসরি চাষাবাদের কোনো সম্পর্ক নেই, অথচ যারা কৃষির প্রধান সুবিধাভোগী। এর ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা আরো বেশি ঋণগ্রস্থ ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়ছে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা, কমছে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ। হাল নাগাদ কোনো সরকারি পরিসংখ্যান না থাকায় বর্তমান মুহূর্তের সাঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। তবে সর্বশেষ কৃষি শুমারি অনুসারে ২০০০-০১ অর্থ বছরে মোট কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৮ লাখ হেক্টর যা ১৯৮০-৮১ সালে ছিল ১ কোটি ২৯ লাখ হেক্টর। তবে প্রকৃত চাষযোগ্য জমির পরিমাণ এই সময়কালে ৯৩.৮ লাখ হেক্টর থেকে কমে হয়েছে ৮৪ লাখ হেক্টর। আবার ১৯৯৫-৯৬ সালে মোট ভূমিহীন পরিবারের হার ছিল ৫.৫% যা ২০০২-০৩ অর্থ বছরে হয়েছে ৬.৮%। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (২০০৪) তথ্যানুসারে প্রায় ৬৪% পরিবার মাথাপিছু এক একরের কম জমির মালিক। অন্যদিকে ৫ একরের বেশি জমি আছে এমন পরিবারের হার মোট জনগোষ্ঠীর ৫%।

বৈষম্যমূলক বাজার ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশের সেঁচ ও ফলনের অপরিহার্য উপাদান পানির নিয়ন্ত্রণও চলে গেছে ঐ মধ্যস্বত্বভোগী ধনিক শ্রেণীর হাতে। গভীর নলকূপ, শ্যালো নলকূপ এবং পাওয়ার পাম্পের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর বাজার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বড় বড় পানি জমিদারদের মাধ্যমে। এরা নিজেদের শ্যালো ও গভীর নলকূপের পানিসহ সেঁচসেবা বিক্রি করছে গরীব কৃষকদের কাছে অত্যন্ত চড়াদরে। দফায় দফায় জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিতে ডিজেল চালিত সেচঁযন্ত্রের খরচও বেড়ে চলেছে।

চাষাবাদের আরেকটি উপকরণ সার ও এখন বেসরকারিখাতের নিয়ন্ত্রনে। আশির দশকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে সারের উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ, বিপণন ও বন্টন ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা হতো। উদারীকরণের ফলে বিএডিসি ক্রমেই এর কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে থাকে এবং সে জায়গা দখল করে নেয় বেসরকারিখাত। ১৯৮৭-৯২ সময়কালের মধ্যে সারের বাজারে বেসরকারিখাতের অংশীদারিত্ব ৫% থেকে বেড়ে ৯০% হয়ে যায়। সারের ওপর সব ধরনের ভর্তুকীও তুলে নেয়া হয় আশির দশকের শেষভাগে। সার আমদানি উন্মুক্ত করা হয়। বেসরকারি আমদানিকারকরা আমদানি করে ডিলারদেরকে সার সরবরাহ করবে, ডিলাররা আবার তা কৃষকের কাছে বিক্রি করবে- এই ব্যবস্থায় একদিকে সারের দর বেড়ে গিয়ে কৃষি উৎপাদন খরচও উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের অভাবে মুনাফালোভী আমদানিকারক ও ডিলাররা চড়াদামে সার বিক্রি করতে থাকে। উচ্চ ফলনশীল বীজ ও অতিমাত্রায় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে জমিতে অধিক সারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে স্বাভাবিকভাকেবই সারের চাহিদা বেড়ে যায়। এই সুযোগ

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

সচিবালয়
উন্নয়ন অন্বেষণ - The Innovators
বাড়ি - ৪০/এ, সড়ক- ১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮০-২-৮১৫ ৮২৭৪
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৫ ৯১৩৫, ই-মেইল: info@unnayan.org ওয়েব: www.unnayan.org

নেয় ডিলার ও আমদানিকারকরা। সরকার অবশ্য ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আমদানিকৃত সারের জন্য চালানপ্রতি ২৫% হারে মূল্য ভর্তুকী চালু করে এই উদ্দেশ্যে যে আমদানিকারকরা ২৫% কম দরে ডিলারদেরকে সার দেবে যেন কৃষকরা ন্যায্য মূল্যে সার পায়। বাস্তবে কৃষকরা কোনো সুফলই পায়নি।

উদারীকরণের সুযোগে অবাধে চাল আমদানির ফলে স্থানীয় উৎপাদকরা আরেকটি বড়ধরনের সংকটে পড়েছে। এমনিতেই কৃষি উপকরণ দুর্মূল্য হওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড়েছে, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্মে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর সঙ্গে সস্তায় আমদানি করা চালের সঙ্গে দেশে উৎপাদিত বোরো চালের অসম প্রতিযোগতায় মার খাচ্ছে কৃষক ও উৎপাদক। বাজার উন্মুক্ত করার আগে থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম ছিল চাল আমদানির প্রধান উৎস। এখন সে স্থান দখল করে নিয়েছে ভারত। মাঠ জরিপে দেখা গেছে ভারতের রত্না ও স্বর্ণা চালের দর স্থানীয় বোরোর চেয়ে কেজি প্রতি অন্তত দুই টাকা কম।

অভ্যন্তরীণ বাজারে মধ্যস্বত্বেভোগীদের দৌরাত্মের কারণে কৃষকরা বছরে ৮৭০ কোটি টাকা লোকসান দেয়। এরমধ্যে শুধু বোরো ধানচাষীরাই লোকসান গুণে ৪৭০ কোটি টাকা। ফসল তোলার পর ধানা ভানা ও চাল বিক্রির জন্য পরিবহন ব্যয় বাবদ যা খরচ করতে হয়, স্বীয় শ্রমের মূল্য বাদ দিলে কৃষকের আয় হয়ে যায় নেতিবাচক।

K…wl fZ©yKx cÖvq k~‡b¨i †KvUvq

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তির আওতায় তিন ধরনের কৃষি ভর্তুকী ব্যবস্থা চালু আছে। এগুলো হলো সবুজ বাক্স, নীল বাক্স ও হলুদ (অ্যাম্বর) বাক্স। সবুজ বাক্স হলো সেইসব ভর্তুকী যা বাণিজ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় বা কৃষিপণ্য মূল্যে কোনো প্রভাব ফেলে না। এটি সরকারি তহবিল থেকে দেয়া হয় যা কোনোভাবেই উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়ক নয়। যেমন কৃষি বিষয়ক গবেষণা কর্মকান্ড, পরিবেশগত কর্মসূচি, রোগ বালাই নিরোধক কর্মসূচি, অভ্যন্তরীণ খাদ্য সাহায্য। এটি অনুমোদিত ভর্তুকী। নীল বাক্স হলো সেই ধরনের ভর্তুকী যা কৃষক বা উৎপাদককে তার উৎপাদন কর্মকান্ড সীমিত রাখার জন্য কিছু শর্তাসাপেক্ষে প্রদান করা হয়। যেমন, কোনো উৎপাদকের একখন্ড বিশাল জমি ও অনেকগুলো গবাদী পশু আছে। সে এগুলোর সাহায্যে যে পরিমাণ কৃষি পণ্য উৎপাদন করতে পারে, তা যেন আংশিক বা পুরোটা না করে, সে জন্য তাকে সরকার তথা রাষ্ট্র কর্তৃক মাথাপিছু গবাদী পশু অথবা একক প্রতি জমি ও ফসলের ওপর ভর্তুকী দেয়া হয়। আর হলুদ বাক্স হলো কৃষি উৎপাদনের জন্য সেই সহায়তা যা কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারণে প্রভাব ফেলে যা চূড়ান্ত বিচারে কৃষি বাণিজ্যেও প্রভাব ফেলে। সে কারণে এই বাক্সের ভর্তুকী ক্ষতিকর বলে বিবেচিত ও নিষিদ্ধ। যেমন, ১০০ মন ধান উৎপাদনের খরচ মন প্রতি ১০ টাকা হারে এক হাজার টাকা। ফলে কৃষক মনপ্রতি কোনোভাবেই ১০ টাকার কমে বাজারে ধান বিক্রি করতে পারবে না, করলে তার লোকসান হবে। কিন্তু সরকার সরাসরি কৃষককে ২০০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা দিল তার উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য। তাহলে কৃষকের প্রকৃত খরচ পড়ল ৮০০ টাকা। ফলে সে বাজারে কমপক্ষে ৮ টাকায় মনপ্রতি চাল বিক্রি করতে পারবে। এভাবে কমদামে কৃষি উপকরণ সরবারহ করেও এই ভর্তুকী দেয়া হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তির আওতায় উন্নয়নশীল দেশগুলো মোট কৃষি উৎপাদন মূল্যের সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত হলুদ বাক্সের আওতায় অভ্যন্তরীণ সহায়তা দিতে পারে। উন্নত বিশ্বের জন্য এই হার হলো ৫%। এই হারগুলো হলো ন্যূনতম অনুমোদিত সীমা। বর্তমানে ৩৪টি উন্নত দেশ এই হারে কৃষি ভর্তুকী তো দিচ্ছেই, সেই সঙ্গে দিচ্ছে সীমাহীনভাবে নীল বাক্স ভর্তুকী। এদের মধ্যে ২৫টি দেশ আবার রঙানি ভর্তুকী দিচ্ছে। আর ২৫টি দেশের মধ্যে ১৯টি আবার ন্যূনতম অনুমোদিত সীমার চেয়ে বেশি ভর্তুকী দিচ্ছে। এটিকে মূল্য-উপকরণ সহায়তা বলা হয়ে থাকে।

কৃষি ভর্তুকী পরিমাপের পদ্ধতিকে বলা হয় 'এএমএস' (এগ্রিগেট মেজারস অব সাপোর্ট বা সহায়তার সমন্বিত পরিমাপ)। এটি হিসেব করা হয় হলুদ বাক্সে দেয়া সহায়তার পরিমাণকে মোট কৃষি উৎপাদনের আর্থিক আয়ের সঙ্গে তুলনা করে।

বাংলাদেশ কৃষিতে অনুমোদিত সীমার অনেক নিচে ভর্তুকী দিচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কৃষিখাতে যে ভর্তুকী দিয়েছে তা মোট কৃষি উৎপাদনের ১.৫৪%। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের এই হার নেমে আসে ০.৮৯%-য়ে। আর ২০০১-০২ অর্থ বছরে এই হার ছিল ০.৬৭%। এর মানেই হলো বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষিতে আসলে তেমন কোনো ভর্তুকী দেয়া হয় না। সামান্য যেটুকু দেয়া হয় তা সেচ, সার ও বীজের ক্ষেত্রে যার খুব সামান্যই ক্ষুদ্র কৃষকের কাছে পৌঁছে। অথচ এই সময়কালে ভারতে কিন্তু কৃষি ভর্তুকী বেড়েছে। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে সেদেশে এএমএস হার ছিল ৪.১২% যা ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে বেড়ে হয়েছে ৮.৫৭%।

বাংলাদেশে সীমিত সম্পদের কারণে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-য়ের দ্বারস্ত হয়ে যেসব শর্তে ঋণ নিয়েছে তাতে কৃষি ভর্তুকী না দেয়া অন্যতম। ফলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় অনুমোদিত হলেও বাংলাদেশ কৃষিতে ভর্তুকী দিতে পারছে না।

যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কৃষিতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে, তবু বাজেট বিশেষণ করলে দেখা যায় যে কৃষি বিষয়ক প্রত্যক্ষ সেবা খাতে বাজেট আসলে কমে গেছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে কৃষি বাজেট যেখানে ৯০% বেড়েছে, সেখানে কৃষি বিষয়ক প্রশাসনিক কর্মকান্ডে বাজেট বেড়েছে ২০০%। অন্যদিকে কৃষি সেবায় বাজেট কমেছে ১০%, কৃষি সম্প্রসারণে ২০% এবং কৃষি বিপণনে ৭৫%। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেট আগের বছরের দ্বিগুণ করা হলেও কৃষি সম্প্রসারণে ৩৪% ও সেবায় ৩% কমে গিয়ে প্রশাসনিকখাতে বেড়েছে ৭৭%।

Mš—e¨ †Kv_vq?

বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো আসলে পড়েছে দ্বিমুখী বিপদে। একদিকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ক্রমাগত চাপ দিয়ে কোনোরকম ভর্তুকী-সমর্থন থেকে বিরত রাখছে, অন্যদিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ন্যূনতম সীমার আওতায় ধনী দেশগুলো কৃষি ভর্তুকী বজায় রাখায় গরীব দেশগুলোর কৃষিখাত অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে।

আবার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় উন্নত দেশগুলো থেকে কৃষি ভর্তুকী কমানো বা তুলে নেয়ার যে আলোচনা চলছে, তা কার্যকর হলে বাংলাদেশ আরেক ধরনের বেকায়দায় পড়বে। এর কারণ হলো বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে এখনও খাদ্য আমদানিকারক দেশ। দেশে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা হয়, তা দিয়ে চাহিদা মেটানো যায় না বলে খাদ্য এখনও আমদানি করতে হয়। আর এই আমদানির বেশিরভাগটাই করা হয় উন্নত দেশগুলো থেকে, যেহেতু ভর্তুকীর কারণে তারা কমমূল্যে এসব খাদ্য রপ্তানি করতে পারে। ভর্তুকী কমে গেলে আর কম মূল্যে খাদ্য আমদানি সম্ভব হবে না। আর এই ধরনের ভর্তুকী বজায় থাকায় সস্তায় খাদ্যশস্য আমদানির কারণে স্থানীয় গরীব কৃষক ও উৎপাদকরা যে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তাতো স্পষ্ট। আবার খাদ্য সাহায্য দেয়ার যে কথা মারাকাশ চুক্তিতে বলা হয়েছে, সেখানেও সমস্যা আছে। খাদ্য সাহায্য শেষ পর্যন্ত স্থানীয় উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে।

এরকম বহুমুখী সংকটে বাংলাদেশের যা করা উচিত তা হলো: প্রথমত, প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো; দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক সুব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র চাষাবাদে সহায়তা দেয়া; এবং তৃতীয়ত, দরিদ্র উৎপাদক ও দরিদ্র ভোক্তার মধ্যে সত্যিকারের ভারসাম্য বজায় রাখা। এ জন্য প্রয়োজন সরকারের কৃষি নীতির পরিবর্তন। জরুরী এক ক্রিয়াশীল সরকারী ব্যবস্থাপনার। অন্যদিকে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশসহ এলডিসিগুলোর প্রয়োজন বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

বর্তমান সংখ্যাটি 'Undercutting Small Farmers -Rice Trade in Bangladesh and WTO Negotionations' অবলম্বনে রচিত; লেখক: রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, ইকবাল আহমেদ ও গোলাম সরওয়ার। আসজাদুল কিবরিয়া বর্তমান সংখ্যাটি প্রস্তুত করেছেন। ইংরেজি সংস্করণটি পাওয়া যাবে
http://www.unnayan.org/other/Unnayan%20Onneshan_TNLP_Agriculture.pdf

চলতি সংখ্যাটি নিজেরা করি ও উন্নয়ন অন্বেষণের যৌথ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রকাশিত। বাংলাদেশ কার্যদলের পক্ষে বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন জাকির হোসেন, সদস্য সচিব।

নিজেরা করি
Nijera Kori

নিশ্চিত করো ন্যায্য বাণিজ্য
MAKE TRADE FAIR

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development